# নয়া রাখাল বালক

**৩০ এপ্রিলের মধ্যে সরকার পতনের আলটিমেটাম দিয়ে বড় ধরনের চমক দিয়েছিলেন আবদুল জলিল। এখনো বলে যাচ্ছেন হাতে থাকা ট্রাম্পকার্ডের কথা। বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে তার বক্তব্য এখন কোনো গুরুত্ব বহন করছে না। শেখ হাসিনাও এমনটি বুঝতে পেরেছেন। তাই বিষয়টি হালকা করার চেষ্টা করছেন। তবে তা আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক সংকট কাটানোর জন্য যথেষ্ট নয়। আলটিমেটাম বুমেরাং হয়ে ফিরছে আওয়ামী লীগের ঘরে। বিএনপিও নিজেদের গুছিয়ে নিল এই সংকটে। জনসম্পৃক্ততার বিষয়টি কারও মাথায়ই নেই। আবদুল জলিল এখনো ৩০ এপ্রিলের কথা বলেই যাচ্ছেন। নিজেকে ঈশপের গল্পের রাখাল বালক বানাচ্ছেন ...** লিখেছেন **মোহসিউল আদনান ও সাইফুল হাসান**

৩০ এপ্রিলের পরদিন পহেলা মে। শ্রমিক দিবস। দিনটি পহেলা এপ্রিলের মতো হলে ভালো হতো আবদুল জলিলের জন্য। ঘুম থেকে উঠে এপ্রিল ফুলের কথা বলে একটা বিবৃতি দিয়ে দিতে পারতেন। আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতা থেকে শুরু করে কর্মী, ভক্ত এমন কি জনগণ পর্যন্ত অভিনব কৌতুক হিসেবে নিতে পারতো ৩০ এপ্রিলের আলটিমেটামকে। আজকের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আর আবদুল জলিলের সরকার পতনের ঘোষণা এমনই এক হাস্যরসের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ এক মাস আগেও পরিস্থিতি পুরোপুরি উল্টো ছিল।

আবদুল জলিলের সরকার পতনের ডেডলাইন বেঁধে অতি আত্মবিশ্বাসী ঘোষণার পর বিএনপি থেকে যখন বলা হলো প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া পল্টন ময়দানে ভাষণ দেবেন তখনো জনমনে সন্দেহ ছিল। মানুষ ধারণা করতে শুরু করেছিল হয়তো কিছু একটা বিষয় আছে। অহেতুক সময় বেঁধে সরকার পতনের কথা আওয়ামী লীগের মতো পোড় খাওয়া দলের বলার কথা নয়। তাই আবদুল জলিল যখন আবার বিএনপির ঘোষণার পাল্টা হিসেবে বললেন, '১ মে খালেদা জিয়া পল্টনের জনসভায় বক্তৃতা দেবেন। তবে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয়, সাবেক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে' তখন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ, সাধারণ মানুষ সবাই অনেক বেশি কৌতূহলী হয়ে উঠলো। অনেকেই এমনকি আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতারাও নড়েচড়ে বসলেন। এ বিষয়ে অন্ধকারে ডুবে থাকা এই নেতারাও অঙ্ক কষতে শুরু করলেন। কিন্তু কেউই হিসাব মেলাতে পারছিলেন না। তখনই প্রশ্ন ওঠে জলিল সাহেব কি হিসাবে এমন ঘোষণা দিলেন? এখনো বা কোন সমীকরণের প্রেক্ষাপটে তিনি ৩০ এপ্রিলের কথা বলেই যাচ্ছেন। শেষ রবিবারের ৩টি অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, '১৩ দিনে অনেক কিছুই ঘটতে পারে।' এই অনেক কিছুর কোনো ব্যাখ্যা তিনি আর দেননি। হয়তো নিজের কাছেও নেই।

আবদুল জলিলের আলটিমেটামকে বিশ্লেষণ করলে তিনটি পয়েন্টের গুরুত্ব বেশি চোখে পড়বে। এক. তার হাতে একটি ট্রাম্পকার্ড আছে। যেটি তিনি এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে ছাড়বেন। দুই. সরকারের পতন ঘটবে গণতান্ত্রিক উপায়ে। তিন. সরকারের পতন ৩০ এপ্রিলের মধ্যেই হবে।

প্রশ্ন হচ্ছে ট্রাম্পকার্ড বলতে আবদুল জলিল কি বোঝাতে চাচ্ছেন! এই বিষয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কঠিন গোপনীয়তা রক্ষা করে চলেছেন। এমন কি আবদুল জলিলের ট্রাম্পকার্ড কি, সে বিষয়ে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্যরাও কিছু জানেন না।

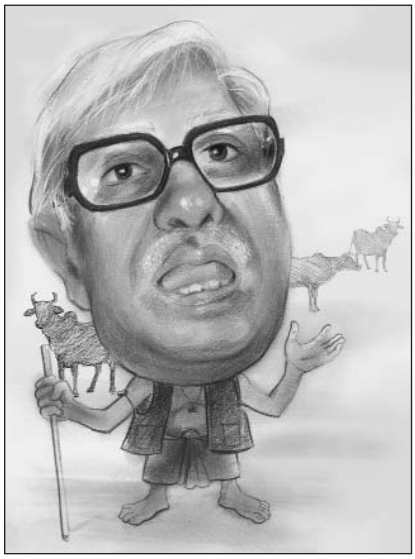

রাজনৈতিক বিভিন্ন হিসাব-নিকাশ থেকে বোঝা যায়, ট্রাম্পকার্ড বলতে তিনি সংসদের মধ্যে এমন কোনো পরিস্থিতির আশা করছেন যাতে সরকার পতনের মতো কোনো ঘটনা ঘটে। আবদুল জলিলের আলটিমেটাম যখন সবচেয়ে আলোচিত, তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল বেশ অন্যরকম। বি. চৌধুরীর বিকল্পধারা, ড. কামাল হোসেনের বক্তৃতা-সমাবেশ অনেক কিছুরই ইঙ্গিত দিচ্ছিল। মেজর মান্নান আর মাহী চৌধুরীর পর আরো ২০-২৫ জন বিএনপি সাংসদ পদত্যাগ করে বিকল্প ধারায় আসার বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে পড়ে আওয়ামী নেতারা। এবং তারা হিসাব করেন ঘটনাটি ঘটবে ২৫ এপ্রিলের মধ্যে। আলোচনা শুরু হয় এরশাদের সঙ্গেও। পদত্যাগকারী মোট সাংসদের সংখ্যা ১০০র ওপরে নিয়ে যাওয়াটাই ছিল লক্ষ্য। একই সঙ্গে চেষ্টা ছিল উপ-নির্বাচনে যেন কেউ অংশ না নেয়। সে ক্ষেত্রে বিএনপি সরকার হয়তো একটা সংকটময় পরিস্থিতিতে পড়তো। এটাই হতে পারতো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার পতনের একমাত্র কৌশল, যা যুক্তিযুক্ত ও বাস্তববাদী। কিন্তু আওয়ামী লীগের পরিকল্পনায় অনেক ফাঁক ছিল। কাগজে-কলমে ধরে নিল এরশাদ সঙ্গে থাকবে আর বাস্তবেও এমন হবে, কিভাবে তা সম্ভব। কারাগারে থাকার চেয়ে এরশাদ যে স্বস্তিময় সাধারণ জীবনটাই বেছে নেবেন তাই তো স্বাভাবিক। এর প্রমাণও তার দল দিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। জলিলের আলটিমেটামের হিসাবের প্রাথমিক গলদ ধরা পড়লো। দ্বিতীয় গলদ ছিল বি. চৌধুরীর কার্যক্রমকে বিশ্লেষণের অক্ষমতায়। এপ্রিলে সরকার পতন ঘটলে আওয়ামী লীগের লাভ হবে, কিন্তু তাতে বি. চৌধুরীর অনেক ক্ষতিই হবে। তার দল তখনো জন্ম নেয়নি। বিকল্প ধারার জন্য সময় প্রয়োজন। এতো তাড়াতাড়ি কোনো ঝামেলায় তারা জড়াবে না। আর মেজর মান্নানের ওপর এমন হামলার পর বিএনপির অন্য কোনো সাংসদ সাহস করবে না সরকারের বিরুদ্ধে এখনই অবস্থান নিতে। আর বিকল্প ধারার রাজনীতি বিএনপি সমমনাদের নিয়েই। তাই আওয়ামী লীগের জন্য লাভ করার রাজনীতি তাদের প্রথম পদক্ষেপ হবে না। এটা আওয়ামী লীগের বোঝা উচিত ছিল। তৃতীয় গলদটা হলো দলীয় শক্তি সম্পর্কে প্রকৃত ধারণার অভাব।

জলিল সাহেব গণতান্ত্রিক উপায়ে সরকারকে ফেলে দেবার কথা বলছেন। কিন্তু সেটা কিভাবে সম্ভব? সেই শক্তি কি আওয়ামী লীগের আছে? বিএনপি সরকারের অসংখ্য ব্যর্থতার বিরুদ্ধে একটি সুষ্ঠু আন্দোলন যারা গড়ে তুলতে পারছে না তারা গণতান্ত্রিক উপায়ে আগামী এক সপ্তাহে সরকারের পতন

**বিএনপি ব্যর্থ একথা সত্য। তাই বলে দেশের জনগণ এখনই একটি মধ্যবর্তী নির্বাচন বা নির্বাচিত সরকারের পতন চায় কি না? আলটিমেটাম যে ভুল সময়ে দেয়া হয়েছে তা আবদুল জলিলের জানা উচিত। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আওয়ামী লীগ আগে যতগুলো হরতাল করেছে তার অধিকাংশই ব্যর্থ**

ঘটাবে কিভাবে? এই প্রশ্ন এখন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদেরও। এখানে আরও একটি প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে, সেটি হলো বিএনপি ব্যর্থ একথা সত্য। তাই বলে দেশের জনগণ এখনই একটি মধ্যবর্তী নির্বাচন বা নির্বাচিত সরকারের পতন চায় কি না? আলটিমেটাম যে ভুল সময়ে দেয়া হয়েছে তা আবদুল জলিলের জানা উচিত। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আওয়ামী লীগ আগে যতগুলো হরতাল করেছে তার অধিকাংশই ব্যর্থ। জনগণ দোকানপাট খোলেনি, রাস্তায় গাড়ি বের করেনি আওয়ামী লীগের হরতালকে সমর্থন করে নয়। নিজেদের নিরাপত্তার জন্যই তারা ঘরে আবদ্ধ থেকেছে। কর্মসূচি হিসেবে হরতাল অজনপ্রিয় বুঝতে পেরে আওয়ামী লীগ ব্যতিক্রমী কর্মসূচির দিকে ঝুঁকছে। গণঅনাস্থা প্রাচীর তার একটি। গণতান্ত্রিকভাবে সরকার আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন দ্বারা

**আওয়ামী লীগের ঘোষণায় বিএনপি ভয় পেয়ে গোপনে আমেরিকায় একটি লবিষ্ট গ্রুপের সাহায্য নেয়। যাতে বুশ প্রশাসন খালেদা সরকারের বিরুদ্ধে না যায়। ঘটনা যাই হোক হ্যারির বক্তব্য যে বিএনপিকে স্বস্তি দিয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই**

হাওয়া ভবন ঘেরাও, ৭২ ঘন্টা হরতাল, অবরোধ, ঘেরাও লংমার্চের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এসব করে সরকার পড়বে না এটা পরিষ্কার। আন্দোলন মোকাবেলা করার কৌশল বিএনপি আওয়ামী লীগের কাছ থেকে শিখেছে। আওয়ামী লীগের কৌশলেই আওয়ামী লীগকে মোকাবেলা করছে খালেদা জিয়ার সরকার। হরতালে আওয়ামী লীগকে রাস্তায় নামতে দেয়নি পুলিশ, ভবিষ্যতেও দেবে না। সে কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। হাওয়া ভবন ঘেরাওয়ের কর্মসূচি থাকলেও জলিলের কর্মীরা এই ভবনের ধারে কাছে ঘেঁষতে পারবে না। পুলিশ এবং ছাত্রদলের কর্মীরাই শক্ত হাতে তা দমন করবে। বিএনপি এখন হার্ড লাইনে আছে। এই পথেই তারা থাকবে। এই সকল কর্মসূচি জনগণের মাঝে তেমন কোনো সাড়া জাগাতে পারেনি। কারণ দেশের জনগণ সামরিক স্বৈরাচার ও গণতান্ত্রিক সরকারের সেবা (!) প্রত্যক্ষ করেছে। ফলে আড়াই বছরের মাথায় সরকার পতনের আন্দোলনে জনগণ খুব বেশি সাড়া দেবে না, এটাই স্বাভাবিক। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হলে বিরোধীদলের কোনো কর্মসূচি থাকে না, জনগণের টাকায় শুল্কমুক্ত গাড়ি আনার প্রতিবাদে কোনো হরতাল হয় না, একজন শামসুল হককে শত টুকরো করলে জলিল সাহেবরা বিবৃতিবাজি ছাড়া কোনো কর্মসূচি ঘোষণা করেন না, তাহলে জনগণ কেন তাদের কর্মসূচিকে সমর্থন করবে? শুধু ক্ষমতায় যাবার জন্য হরতাল, অবরোধকে জনগণ কেন সমর্থন দেবে? জনগণ তো দূরের কথা, আওয়ামী লীগের কর্মীরাও এই বক্তব্যকে সমর্থন করে না। তারা জানে এখন কিছুই হবে না। শুধু শুধু আন্দোলনের নামে মার খেতে হবে। আর ডেডলাইন দিয়ে সরকার পতনের ইতিহাস কোথাও নেই। কর্মীরা, নেতারাও মনে করেছিল কোনো এক মেকানিজম তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সেই অপেক্ষার প্রহর শেষ। এখন শুধু আশাহত হবার পালা।

আওয়ামী লীগ যদি একটা বৃহৎ জোট গঠন করতে পারতো তবুও জলিলের আশাবাদী হবার কারণ ছিলো। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির একটি বৃহৎ ঐক্যের কথা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বারবার করা হলেও বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি। দেশের বামদলগুলোর সংগঠন না থাকলেও তাদের সম্মিলিত একটি ভয়েস আছে। একমাত্র জাসদ (ইনু) ছাড়া আর কোনো বামদল আওয়ামী লীগের সঙ্গে কোনো যুগপৎ কর্মসূচিও ঘোষণা করেনি। রাজনীতিতে জাসদের যে অবস্থান, তাতে যুগপৎভাবে জাসদের থাকা না থাকা আওয়ামী লীগের জন্য একই অর্থ বহন করে। যুগপৎ আন্দোলন বা বৃহৎ ঐক্যের ক্ষেত্রে বামদলগুলো আওয়ামী লীগের ব্যাপারে সন্দিহান। যে কারণে বামদলগুলো জোট করার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে বাম নেতৃবৃন্দের এক দু'বার আলোচনা হলেও তা ফলপ্রসূ উদ্যোগে পরিণত হয়নি। ফলে এখন পর্যন্ত সরকার পতনের আন্দোলনের মাঠে আওয়ামী লীগ সম্পূর্ণ একা। ড. কামাল হোসেনের ঐক্য প্রচেষ্টা ও ডা. বি. চৌধুরী এখনই সরকার পতনের কথা মুখে বললেও এখন পর্যন্ত তাদের সঙ্গেও ঐক্যের কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। ড. কামাল ১৭ দফা দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সামনে। ১৭ দফা মানলে ড. কামাল আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোট গড়বেন। ১৭ দফা আওয়ামী লীগের জন্য ইগোর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আওয়ামী লীগের মতো পরাক্রমশালী একটি দলের সামনে যখন ক্ষুদ্র বাম আর ড. কামালের মতো দলগুলো আলটিমেটাম দিয়ে বসে, তখন আওয়ামী লীগের অসহায়ত্ব আর রাজনৈতিক দৈন্যতাই ফুটে ওঠে। গত ৫০ বছরে ঐতিহ্যবাহী এই দলটি সম্ভবত এতোটা রাজনৈতিক দৈন্যতায় আর কখনও পড়েনি। ভারতের কংগ্রেসের মতোই অবস্থা দাঁড়িয়েছে আওয়ামী লীগের।

৩০ এপ্রিলের ঘোষণা চূড়ান্ত পরিহাসে পরিণত হচ্ছে এটা পরিষ্কার। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাসহ দলীয় নেতা-কর্মীরাও এটা বুঝতে পারছেন। যে কারণে শেখ হাসিনা ইদানীং তার বক্তব্যে সাধারণ সম্পাদককে ডিফেন্স করছেন। বলছেন খালেদা জিয়া তার সরকারকে পতনের জন্য ৮৮ বার আলটিমেটাম দিয়েছিলেন। কিন্তু হাসিনা বলেননি খালেদা জিয়া বা বিএনপি কী কোনো ডেডলাইন দিয়েছিল কি না? শেখ হাসিনা বিষয়টি হালকা করার জন্য বলছেন সাধারণ সম্পাদকের ঘোষণাতেই সরকারের হাঁটু কাঁপছে, আর তিনি নিজে এবং ১৩ প্রেসিডিয়াম সদস্য তো এখনো কিছু বলেননি। এ বক্তব্যের পর মনে হতে পারে আলটিমেটাম আবদুল জলিলের নিজস্ব বক্তব্য। অথচ সত্য হচ্ছে প্রেসিডিয়ামের বৈঠকে বিষয়টি দলীয় বক্তব্য হিসেবেই নির্ধারণ করা হয়েছে। সাধারণ সম্পাদক নিজেও বলেছেন এটা দলের বক্তব্য, নিজের নয়। এটাই স্বাভাবিক, কেননা আওয়ামী লীগ-বিএনপির মতো দলগুলোতে নেত্রীর অনুমতি ছাড়া মুখ হা করার ইতিহাস নেই। কেউ করলে তাকে হতে হয় বহিষ্কৃত। তাহলে কি শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগকে বাঁচাতে এখন মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছেন?

সম্ভবত তাই। সরকার পতনের এই ঘোষণায় বিএনপির কোনো ক্ষতি হলো না। হয়েছে আওয়ামী লীগের। এখনো সবাই চুপচাপ। ৩০ এপ্রিলের পর কোন্দল বেড়ে যাবে অনেক। সিনিয়র নেতৃবৃন্দ বলেছেন, তাদের সঙ্গে আলোচনা না করেই ডেট ঘোষণা করা হয়েছে। কার্যনির্বাহী কমিটিতেও বিষয়টি নিয়ে ঝড় ওঠে। সিনিয়র নেতারা দলীয় সভানেত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করছেন। দলীয় নেত্রী একজন সাবেক আমলা ও কয়েকজন ব্যবসায়ী নিয়ে দল চালাতে চাচ্ছেন। ফলে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত হঠাৎ করেই পার্টির সামনে আসছে। যে জন্য নেতা-কর্মীরা এসব সিদ্ধান্তের বিষয়ে অন্ধকারে থাকছে। তারা জনগণের কাছে বিষয়গুলো তুলে ধরতে পারছে না। এতে দলীয় ক্ষোভ বেড়েই চলেছে। অর্থাৎ ঘরে-বাইরে আওয়ামী লীগের হাই কমান্ড বিশ্বস্ততা হারাচ্ছে।

শেখ হাসিনার এমন বক্তব্যে পরিষ্কার যে

আওয়ামী লীগ এখন ব্যাক ফুটে এসে দাঁড়িয়েছে। আগে থেকে না ভেবে কাজ করলে ফলাফল এমনটাই হওয়া স্বাভাবিক। ১৮ এপ্রিল সরকার পতনের আলটিমেটামের পাশাপাশি আবদুল জলিল এটাও বলেছেন, সরকারের উচিত পদত্যাগ করার। বলছেন না পদত্যাগে বাধ্য হবে সরকার।

আওয়ামী লীগের এই পিছিয়ে আসার পেছনেও প্রকাশিত হয়েছে তাদের রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার। শুধু আওয়ামী লীগের নয়, পুরো দেশেরই। ৩০ এপ্রিলের ঘোষণার পর বিএনপি সরকারের চরম আতঙ্ক কেটে যায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাসের একটি বিবৃতিতে। তিনি সাংবাদিকদের হঠাৎ জানান, মার্কিন সরকার চায় সাংবিধানিক পদ্ধতিতে বাংলাদেশের সরকার পরিবর্তন হোক। হ্যারি কে টমাস জোর দিয়ে বলেছেন, অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার হটানোতে আমেরিকার সায় নেই। হ্যারির বক্তব্যের পর বিএনপি মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে যায়, জলিলের হুমকির সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্মতি নেই। অতএব নিশ্চিন্তে তারা অভ্যন্তরীণ সমস্যা মোকাবিলার দিকে নজর দেয়। একটি সূত্র জানায়, আওয়ামী লীগের ঘোষণায় বিএনপি ভয় পেয়ে গোপনে আমেরিকায় একটি লবিষ্ট গ্রুপের সাহায্য নেয়। যাতে বুশ প্রশাসন খালেদা সরকারের বিরুদ্ধে না যায়। ঘটনা যাই হোক হ্যারির বক্তব্য যে বিএনপিকে স্বস্তি দিয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অন্যদিকে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যের প্রতিবাদে কড়া প্রতিক্রিয়া জানান আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। তারপর থেকে আমেরিকার সঙ্গে আওয়ামী লীগের সম্পর্কে টানাপড়েন চলছে। জানা গেছে, সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের জন্য মহীউদ্দীন খান আলমগীর হ্যারি কে টমাসকে মধ্যাহ্নভোজে দাওয়াত করেন। তারপরও আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্কের তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। সেখানে হ্যারি কে টমাস আওয়ামী লীগের আলটিমেটামের বিপক্ষে তার অবস্থান নিশ্চিত করেন। হ্যারির বক্তব্যের পর থেকেই মূলত সবাই নিশ্চিত হয়ে গেছে, ৩০ এপ্রিলে কিছু ঘটবে না।

প্রশ্ন হচ্ছে, এত কিছুর পরও আবদুল জলিল ৩০ এপ্রিলের ঘোষণা থেকে সরে আসছেন না কেন? এর সম্ভাব্য দুটো কারণকে চিহ্নিত করা যায়। এক. গত নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগের যে নাজুক অবস্থা তা থেকে দলীয় কর্মীদের বের করে আনা। অর্থাৎ দলীয় কর্মীদের চাঙ্গা করার জন্য এটা একটা কৌশল হিসেবে নিতে পারে। দ্বিতীয়ত সরকারকে চাপের মধ্যে রাখা, যাতে বিরোধী দলের ওপর নির্যাতন কমে। কিন্তু এর কোনোটিতেই আওয়ামী লীগের লাভ হবে না। কারণ ৩০ এপ্রিলের মধ্যে সরকার পতনে ব্যর্থ মানেই সরকার এটাকে নিজেদের বিজয় হিসেবে দেখবে। অন্যদিকে এতদিন ধরে জলিল দলীয় নেতা-কর্মীদের যে আশা দিয়ে এসেছেন, তা পূরণে ব্যর্থ হলে কর্মীদের মধ্যে হতাশা বাড়বে।

আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ঐতিহ্য আছে। স্বাধীনতা থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনেই আওয়ামী লীগ অন্য দলগুলোর সামনে উদাহরণ হয়ে ছিল। রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন এই দলটি অকারণে দেশকে এমন একটি অস্থির অবস্থার দিকে নিয়ে গেলো কেন, সেটাই আশ্চর্যের বিষয়। ডেডলাইন দিয়ে যেমন সরকার পতন হয় না, তেমনি দল ও কর্মীদের প্রস্তুত না করলে সফল আন্দোলন সংগ্রাম হয় না। দলীয় সিদ্ধান্ত থেকে কর্মীদের অন্ধকারে রেখে তো নয়ই। জনসম্পৃক্ততার বিষয়টিও তারা বিবেচনায় আনেননি। আওয়ামী লীগের উচিত ছিলো নিজেদের দল গুছিয়ে সমমনা দলগুলোকে একটি প্লাটফর্মে নিয়ে আসা। দেশের জনগণকে আরেকটু সময় দেয়া। যাতে সরকারের নিপীড়ন আর ব্যর্থতায় জনগণ আন্দোলনের যৌক্তিকতা খুঁজে পায়। তা না করে ৩০ এপ্রিলের ডেডলাইন দেয়া শুধু ভুলই নয়, হঠকারী সিদ্ধান্তও বটে। আবদুল জলিল যদি এই ঘোষণা এখন না দিয়ে আরও দেড় বছর পরে দিতেন তবে আওয়ামী লীগ লাভবান হতো। এই সময়ে তারা নিজেদের সংগঠন গোছাতে পারতো। কর্মীদের আন্দোলনের জন্য তৈরি করতে পারতো। তখন আর হাওয়া ভবন ঘেরাওয়ের কর্মসূচী নিয়ে টেনশন করতে হতো না। দলীয় কর্মীদের সঙ্গে জনগণকে সঙ্গে পেতো। জনগণ পরাজিতদের কাতারে থাকতে পছন্দ করে না। তাই তারা এখন সাড়া দেয়নি। কিন্তু অপেক্ষা করলে জলিলের সফল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এখন যেটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ৩০ এপ্রিলের মধ্যে সরকারের পতন না হলে কি বলবেন আবদুল জলিল? তিনি কি বলবেন, সরকার ক্লিনিক্যালি ডেড, সরকার আমাদের ঘোষণায় ভয় পেয়েছে। সরকার যে সত্যিই ডেড সেটা প্রমাণ করার জন্যই এই ঘোষণা। বাস্তবতা কি বলে? একজন রাখাল বালক হিসেবে আবদুল জলিল প্রতিষ্ঠিত হবেন।

জলিল নিজেই বলেছেন, বর্ষার সময়ে দেশে আন্দোলন হয় না। ৩০ এপ্রিলের মধ্যে সরকার পতন না হলে তারা আরও এক বছর ক্ষমতায় থাকার সুযোগ পাবে। এখন পর্যন্ত এমন কোনো আলামত দেখা যাচ্ছে না যাতে প্রমাণিত হয়, জলিলের ডেডলাইনের মধ্যে সরকারের পতন হবে। প্রশ্ন হলো, তাহলে কি আরো এক বছর আওয়ামী লীগ ঘরে বসে থাকবে? এতটা ধৈর্য কি তারা ধরতে পারবে? কি করবে এখন আওয়ামী লীগ?

**দেশের বামদলগুলোর সংগঠন না থাকলেও তাদের সম্মিলিত একটি ভয়েস আছে। একমাত্র জাসদ (ইনু) ছাড়া আর কোনো বামদল আওয়ামী লীগের সঙ্গে কোনো যুগপৎ কর্মসূচিও ঘোষণা করেনি। রাজনীতিতে জাসদের যে অবস্থান, তাতে যুগপৎভাবে জাসদের থাকা না থাকা আওয়ামী লীগের জন্য একই অর্থ বহন করে**

হয়তো সংসদ থেকে পদত্যাগ করবে। সংবিধানের ৬৭(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পরিস্থিতিজনিত কারণে আসন শূন্য হবার বিধান রয়েছে। ৯০ কার্য দিবস কোনো সংসদ সদস্য সংসদে অনুপস্থিত থাকলে তার সংসদ সদস্যপদ শূন্য বলে বিবেচিত হবে। ২৫ জুন থেকে আওয়ামী লীগের সংসদ বর্জন অব্যাহত রয়েছে। এক হিসাবে দেখা যায়, গড়ে তারা ৫৪ কার্য দিবস সংসদে অনুপস্থিত। জানা গেছে, আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যরা শেখ হাসিনার কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। তবে সাংসদরা নেত্রীকে জানিয়েছেন, পরিস্থিতি চূড়ান্ত পর্যায়ে না গেলে পদত্যাগপত্র জমা না দিতে। ৫৮ জনের পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে কোনো লাভ হবে না, এটা আওয়ামী লীগও বুঝতে পারছে। কিন্তু এছাড়া আর কোনো বিকল্প কি আছে? সম্ভবত না। এটা হচ্ছে মানসম্মান বাঁচানোর একমাত্র পথ, যেটা খোলা আছে। তারপর? তখন কি আবার আলটিমেটাম? প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সভানেত্রী নিজে দেবেন ডেডলাইন?

এটা ভবিষ্যৎ বলবে। কিন্তু বর্তমান কি বলছে? নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে দাঁড়িয়েও সংশপ্তক আবদুল জলিল ৩০ এপ্রিলের কথা বলেই যাচ্ছেন, বলেই যাচ্ছেন।

আবদুল জলিলের মুখে বারবার ৩০ এপ্রিলের আলটিমেটাম আমাদের নিয়ে যাচ্ছে আড়াই হাজার বছর আগে ঈশপের গল্পে। 'বাঘ আসিলো', 'বাঘ আসিলো' বলে চিৎকার করা সেই রাখাল বালকের নয়া প্রতিচ্ছবি যেন আজকের আবদুল জলিল।